দৈনিক খবর

তারিখ ... 16 AUG 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

17

মতামত

জাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড এ কথা সর্বজন স্বীকৃত। মেরুদন্ড দুর্বল হলে কোন প্রাণী যেমন সোজাভাবে দাঁড়াতে পারেনা তেমনি শক্তভাবে চলতেও পারে না।

স্বাধীনতা পূর্বকালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে আমাদের ভূমিকা ছিল না। কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয়ের বিশ বছর পরও আমাদের সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থার ভার বহন করার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা-উত্তরকালে অবশ্যি দু'বার কমিশন গঠন করে রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছিল কিন্তু তার ফসল জাতির জন্য ভোগে আসেনি।

১৯৭২ সালে পরীক্ষাসমূহে যে গণ টোকাটুকি শুরু হলো তার জের আজও শেষ হয়নি। পরে অবশ্যি হলে পুলিশ মোতায়েন করে এস এস সি/ এইচ এস সি পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হলে পাশের হার নিম্নগতি হয়। কিন্তু এটাই কি সমস্যার সমাধান? হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বহিষ্কার এবং অকৃতকার্য হয়ে শিক্ষাঙ্গন থেকে ঝরে পড়ে। বৃদ্ধি পায় দরিদ্র পিতা-মাতার দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা।

বিশটি বছর পার হওয়ার পরেও শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সুষ্ঠু রূপরেখা তৈরী করা সম্ভব হল না। বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ কারো এই দায়িত্ব এড়াবার অবকাশ নেই। এক সময় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ফলে দেখা যায়, দরিদ্র ও অল্প শিক্ষিত অভিভাবকও প্রাইভেট টিউশনের প্রতি নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। ঐ আইন প্রকারান্তরে প্রাইভেট টিউশনীর দ্বার প্রশস্ত করে দেয়।

অন্যদিকে নোট ছাপানো আদৌ বন্ধ থাকেনি। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায়িক সুবিধা বহাল রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি না থাকায় প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার মান দুঃখজনকভাবে নিম্নমুখী। শহরগুলোতে কিন্ডার গার্টেন নামে যে শিক্ষা ব্যবস্থা দেখা যায় তার উপর সরকারের তেমন তদারকি আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। অনেক বিদ্যালয়ের বই-পুস্তক ডিন দেশের। শহরের অলি গলিতে যেভাবে প্রিক্যাডেট, কোচিং সেন্টার, টিউটরিয়াল, কিন্ডার গার্টেন লেখা লাল সালু নজরে পড়ে তাতে মনে হয় শিক্ষা ব্যবস্থা একটা তদারকিহীন জমজমাট ব্যবসার ক্ষেত্র।

টেকস্ট বুক বোর্ড নামীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে পুস্তক প্রণয়নের জন্য। কিন্তু বই পুস্তকের মান গ্রহণযোগ্য নয়। বানান ভুল সম্পর্কে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। প্রাথমিক শিক্ষা সরকারী নিয়ন্ত্রণে। দরিদ্র দেশের জন্য এ ব্যবস্থার সুফলদায়ক। এআইডি, ইউনিসেফ ও ফ্যামিলিটিজ বিভাগের সহযোগিতায় পল্লী এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার মান বাড়েনি। মাধ্যমিক পর্যায় শিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্নমুখী। পল্লী এলাকার স্কুলগুলোর গত কয়েক বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নিম্নমুখী মানের সুযোগে সার্টিফিকেট জাল ব্যবসাও প্রসার লাভ করেছে। সম্প্রতি পুলিশ সার্টিফিকেট জালকারী একটি চক্র গ্রেফতার করেছে। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ১৯৮২ সাল থেকে তারা এ ব্যবসায় নিয়োজিত। জাতির স্বার্থে ১৯৮২ সাল থেকে বিভিন্ন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সার্টিফিকেট পরখ করা আবশ্যক।

শিক্ষা ব্যবস্থায় সুষ্ঠু নীতি না থাকায় এক দিকে গড়ে উঠেছে ক্যাডেট স্কুল ও কলেজ যা বিশেষ শ্রেণীর সন্তানদের জন্যেই সুযোগের পথ উন্মুক্ত করেছে।

উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ করার নীতি গৃহীত হলেও শিক্ষক ও উপকরণের অভাবে ঈপ্সিত ফল তাৎক্ষণিকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সাম্প্রতিক এসএসসি পরীক্ষায় প্রায় শতকরা সত্তর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হয়ে আগামী প্রজন্ম কি হারে অবক্ষয়মুখী তা জাতিকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে। দুর্ভাগ্য যে জাতি এনিয়ে আদৌ মাথা ব্যথার কোন নমুনা দেখায়নি। ফি বছর পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর পত্রিকাগুলো কিছু লেখালেখি করে। কিছুদিন পর আর কোন সাড়া থাকে না। এদিকে অভিভাবক ও শিক্ষকরাও তেমন কিছু আজ আর ভাবে না। অন্যান্য সমস্যার মত এটাও গা সওয়া হয়েছে।

এ বছর শিক্ষা বিভাগ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থাৎ কম্পিউটারে ফল টেবুলেশন করেছে। কিন্তু ফল নাকি আশাব্যঞ্জক নয়। যার শরীর ক্যান্সারগ্রস্ত তার মাত্র একটি আংগুল কেটে ব্যাধি মুক্তির চেষ্টা করে কি লাভ? বিদ্যালয়ের পাঠ পদ্ধতি নিম্নমানের বিধায় আজ ডিগ্রী পর্যায় পর্যন্ত প্রাইভেট টিউশনি প্রথা প্রসারিত। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়, পরীক্ষার খাতা মুদি দোকানে বিক্রি হয়, পরীক্ষায় ভুল প্রশ্ন দেয়া হয়। এমনকি পরীক্ষক তার বাসায় বসে ডিগ্রী পরীক্ষার খাতা লিখার সুযোগ দেয়ার মত কলংকজনক ঘটনাও সম্প্রতি ঘটেছে। এ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শৈথিল্যের একটি অধ্যায়। এ নিয়ে অভিভাবক, শিক্ষক, তথা বুদ্ধিজীবীদের ভাবনার সময় এসেছে।

শুধুমাত্র নম্বরের উপর গুরুত্ব দিলে অসৎ উপায়ে নম্বর বৃদ্ধির হিড়িক বাড়বে বৈ কমবে না। এ বছর কম্পার্টমেন্ট পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক। দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়া যেদিও অসৎ উপায় ছাড়া) ছাত্রদের ভাল কলেজে আবেদন করার সুযোগ যেখানে নেই সেখানে কম্পার্টমেন্ট পরীক্ষা চালু রেখে জাতির কলংকের বোঝা বৃদ্ধি ছাড়া আর কি?

উচ্চ শিক্ষার অবস্থা সব চেয়ে নৈরাশ্যজনক। জাতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার অবস্থায় নেই। আলাউদ্দিনের প্রদীপও নেই যে রাতারাতি তা গড়ে উঠবে। এহেন অবস্থায় সেশন জট সৃষ্টির অবস্থা রোধ অত্যাবশ্যক। কিন্তু এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে গড়িমসি জাতি কত আর বইবে? ছলছুতায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার ফলে ক্যাপাসিটির ৫/৬ গুণ ছাত্র জড় হয়েছে। বক্তৃতা বিবৃতিতে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এজন্য চাই সকলের আন্তরিক প্রয়াস। ভিসি বা শিক্ষকরা আইন শৃংখলার দায়িত্ব পালক করুক তা কেউই কামনা করে না। সংশ্লিষ্ট সকলকে জাতীয় পবিত্র দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুড়ি কিংবা অতীতে কে কি করেছে তা বাদ দিয়ে বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির পথ বের করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর এ জন্য প্রয়োজন জাতীয় ঐক্যমত।

সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ আর যেন হানাহানি, রেষারেষি, অস্ত্র ঝংকারে মুখরিত না হয়। আগামী প্রজন্মকে জাতির সঠিক নেতৃত্ব দেয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পবিত্র অংগন হোক আমাদের বিদ্যাপীঠ। এ অঙ্গন কোন দলের নয়, এ অঙ্গন কোন গোষ্ঠীর নয়, এ বিদ্যার্থীদের জীবন যুদ্ধের মহড়াস্থল। জাতির বর্তমান সংকট লগ্নে সর্বসম্মতিক্রমে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন অত্যাবশ্যক।

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ
শামসুল হক